চোখ ভাল রাখুন

চোখের স্বাস্থ্য

বড় থেকে ছোট—সব বয়সেই হতে পারে চোখের সমস্যা। সমাধানে চাই সময়মতো চিকিৎসা। জানাচ্ছেন আই স্পেশালিস্ট ডা. হিমাদ্রী দত্ত। লিখছেন মধুরিমা সিংহ রায়।

চোখের অসুখ—শুনলেই অনেকে ডিপ্রেসড হয়ে পড়েন। এতদিন ধরে চারপাশের রঙিন জগতটাকে স্বচ্ছ, স্পষ্টভাবে দেখছিলেন! হঠাৎ যদি দৃষ্টিশক্তি কমে যায় বা অন্য কোনও অসুখ বাঁধান, তাহলে সেই রঙিন জগতটাই তো ঝাপসা হয়ে যায়। এ ব্যাপারটা মেনে নেওয়া খুবই মুশকিল। কিন্তু সমস্যা থাকলে সমাধানের রাস্তাও বের করতে হবে। তাই, চোখের অসুখ প্রতিরোধ করতে নিয়মিত চেক-আপ, জীবনযাপনে পরিবর্তন আর খানিকটা সতর্কতা—এতেই হবে।

বাচ্চাদের সাধারণ চোখের সমস্যা

যদি চোখের জন্মগত কোনও অসুখ থাকে, তাহলে সেগুলো প্রথমেই ধরা পড়ে যায়। এধরনের অসুখের অনেকগুলোই চিকিৎসাযোগ্য নয়। তবে আপাতদৃষ্টিতে বাচ্চার চোখে সমস্যা বোঝা না গেলেও সমস্যা থাকতে পারে। অক্ষর পরিচয় হওয়ার পরও বাচ্চার ভিশন রেকর্ডিং করা প্রয়োজন। বিশেষত স্কুলে ভরতি হওয়ার পরে ভিশন রেকর্ডিং করে নিলে ছোটবেলাতেই কোনও সমস্যা থাকলে ধরা পড়ে যায়। বাচ্চাদের পড়ার বইতে অক্ষরের সাইজ বড় থাকে, তাই সাধারণত ওদের পড়তে কোনও অসুবিধে হয় না। খেয়াল করুন, বাচ্চা টি.ভি দেখার সময় টি.ভির খুব কাছাকাছি এগিয়ে যাচ্ছে কি না। দূরের কিছু দেখার সময় চোখ কুঁচকে দেখার চেষ্টা করছে কিনা। এরকম লক্ষণ দেখলে চোখের পরীক্ষা করিয়ে নেবেন। বেশি বয়সে গিয়ে যদি দেখা যায় যে, তাঁর ভিশন বা দৃষ্টিশক্তি কম আছে, তাহলে সেটি পুরোপুরি সারিয়ে তোলা সম্ভব নয়। লেজি আইজ বা অ্যাম্বলোপিয়া ছোটবেলায় ধরা পড়লে পুরোপুরি সেরে যেতে পারে। ভিশন কারেকশনের জন্য প্রয়োজনে ছোটবেলা থেকেই চশমা পরতে হতে পারে। সাধারণত আমরা যখন কোনও বস্তু দেখি, তখন সেটির উপর কোনও আলো প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে পৌঁছয়। চোখের কর্নিয়া আর লেন্সের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়ে রেটিনার উপরে পড়ে। যদি আইবলের লেংথ ছোট হয় (হাইপারমেট্রোপিয়া), তাহলে রেটিনার উপর আলো সরাসরি না পড়ে, রেটিনার পিছনে পড়ে। সেক্ষেত্রে কনভেক্স লেন্স (প্লাস পাওয়ার) দিয়ে সমস্যার সমাধান করা হয়। আবার আইবলের আকার যদি বড় হয়, তাহলে আলো রেটিনার সামনে পড়ে। তখন কনকেভ লেন্স দেওয়ার প্রয়োজন হয়। চশমা নির্বাচনের মূল মাপকাঠি এটাই। হাইপারমেট্রোপিয়া অনেকের ক্ষেত্রেই বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কমতে পারে। মায়োপিয়া কিন্তু বাড়তেও পারে। মায়োপিয়া পুরোপুরি সেরে যায় না। বাচ্চাদের ছোট স্কুইন্ট থাকলে যদি ডাক্তারের পরামর্শে অপারেশন করানো হয়, তাহলে ভবিষ্যতে স্কুইন্ট সংক্রান্ত কোনও সমস্যা হয় না সাধারণত। তবে রিফ্র্যাক্টিভ এরর-এর জন্য স্কুইন্ট হলে, সবক্ষেত্রে সার্জারি করার প্রয়োজন হয় না। স্কুইন্ট যদি থেকেই যায়, তাহলে সেই চোখের দৃষ্টিশক্তি কমতে পারে। তাই স্কুইন্ট কোনওভাবেই অবহেলা করবেন না। এছাড়া যে সমস্যাগুলো দৃষ্টিশক্তি কমাতে পারে, সেগুলো বেশিরভাগই জন্মগত সমস্যা। ছোটবেলা থেকে চশমা পরলে ভবিষ্যতে দৃষ্টিশক্তি ভাল হয়ে যাবে, এমনটা নয়। হাইপারমেট্রোপিয়া থাকলেই একমাত্র চোখের পাওয়ার কমতে পারে। মায়োপিয়ায় পাওয়ার কমে না সাধারণত।

বাচ্চাদের ছোট স্কুইন্টে ডাক্তারের পরামর্শে সার্জারি করানো হয়, তাহলে ভবিষ্যতে স্কুইন্ট সংক্রান্ত কোনও সমস্যা হয় না।

বড়দের সমস্যা

রিফ্র্যাক্টিভ এরর: চল্লিশের পর আমাদের সকলেরই কাছের দেখতে কিছুটা সমস্যা হয়, যাকে আমরা 'চল্লিশে চালশে' বলি! এঁদের নিয়ার কারেকশন দিতে হয়। তবে কারেকশন (চশমা বা লেন্স) দেওয়া সত্ত্বেও যদি দৃষ্টিশক্তি উন্নত না হয়, তাহলে দেখতে হবে চোখের অন্য অসুখ আছে কি না।

চোখের প্রেশার ও গ্লকোমা: চোখের ভিতরে একধরনের

ভাল চোখ বন্ধ রেখে খারাপ চোখকে বেশি ব্যবহার করলে, ও এক্সারসাইজ় করলে লেজ়ি আইজের সমস্যার সমাধান সম্ভব।

ফ্লুইড থাকে। সাধারণ অবস্থায় এই ফ্লুইড যে পরিমাণে তৈরি হয়, সেই অনুপাতেই বেরিয়ে যায়। অর্থাৎ একটা ভারসাম্য বজায় থাকে। কিন্তু যদি এই ভারসাম্য কোনও কারণে ব্যাহত হয়, অর্থাৎ ফ্লুইড উৎপাদনের তুলনায় ড্রেনেজ কম হয়, তাহলে চোখের ভিতরে জল জমে আভ্যন্তরীণ প্রেশার তৈরি করে। একে বলে ইন্ট্রাঅকুলার প্রেশার। আইবলেরপিছন থেকে অপটিক নার্ভ বেরিয়ে আসে। বর্ধিত ইন্ট্রাঅকুলার প্রেশার অপটিক নার্ভে একধরনের চাপ সৃষ্টি করে। ফলে নার্ভ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে এই নার্ভ ড্যামেজ একদিনে হয় না। ধীরে ধীরে হয়। নার্ভ নষ্ট হয়ে গেলে সেগুলো কিন্তু আর নতুন করে তৈরি হয় না। ধীরে ধীরে এই সমস্যা কিন্তু দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে দিতে পারে। এর চিকিৎসা হল ওষুধের সাহায্যে ফ্লুইড উৎপাদন কমানো। তাহলে উৎপাদন আর নির্গমনের মধ্যে ভারসাম্য আনা হয়। এর লক্ষণের মধ্যে প্রাথমিক অবস্থায় চোখে ব্যথা হয়, কাছের পাওয়ার বদলে যায়। ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা করা দরকার। আইরিসে (চোখের মণি) লেজ়ার দিয়ে ছিদ্র করে চিকিৎসা করা যেতে পারে। অপটিক নার্ভ মস্তিষ্কে ইমেজ ট্রান্সমিশন করে। বেশিরভাগ মানুষেরই ড্রেনেজ চ্যানেল সরু হয়ে যায়। সাধারণত ওষুধে এধরনের গ্লকোমা নিয়ন্ত্রণে থাকে। যদি ওষুধে (অ্যান্টি গ্লকোমা আই ড্রপ) নিয়ন্ত্রিত না হয়, তখন সার্জারির কথা ভাবা হতে পারে। যদি আপনার বয়স চল্লিশের উপরে হয় আর আপনার পরিবারে গ্লকোমার ইতিহাস থাকে, তাহলে নিয়মিত চোখ পরীক্ষা করানো জরুরি। ডায়াবিটিস থাকলেও সতর্ক হন।

চোখের স্ট্রোক: রেটিনার বিভিন্ন কোষকে জীবিত রাখার জন্য অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়। অক্সিজেন বাহক রক্ত সঞ্চালনের এই কাজটা করে শিরা ও ধমনী। যদি কোনও কারণে রেটিনার রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে হেমারেজ হয়। একেই সাধারণভাবে স্ট্রোক বলে। ধমনীগুলো যদি খুব সরু হয়ে যায় বা আর্টারিয়াল স্ক্লেরোসিস হয়, তাহলে শিরার উপর চাপ পড়ে ও বিভিন্ন জায়গা থেকে রক্ত বেরতে পারে। চোখেও স্ট্রোক হতে পারে, এমনকি একদম হঠাৎ করেই হতে পারে। হঠাৎ একটা চোখে কম দেখতে পাওয়া এর প্রধান লক্ষণ। স্ট্রোক হলে প্রাথমিকভাবে পরীক্ষা করে নিন ব্লাড শুগার, ব্লাড প্রেশার বা কোলেস্টেরল আছে কি না। দেখে নিতে হয় রেটিনার ঠিক মধ্যভাগে জল জমেছে কিনা। যদি জল জমে তাহলে অ্যান্টি ভিইজিএফ ইনজেকশন দিতে হয়। যদি দৃষ্টিশক্তি খুব খারাপ না থাকে, অপেক্ষা করা হয় ব্লাড অ্যাবজ়র্বশনের জন্য। তারপরে অ্যাঞ্জিওগ্রাম করে লেজ়ার সার্জারির প্রয়োজন হতে পারে।

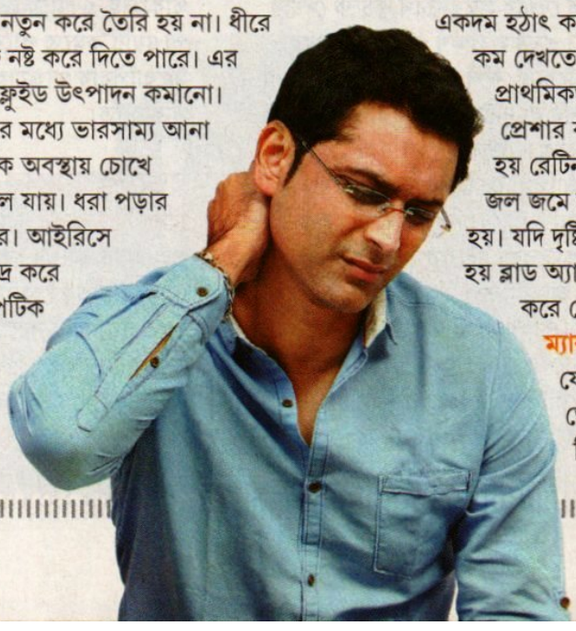

ম্যাকুলার ডিজেনারেশন: চোখের স্ট্রোক যেমন রেটিনার একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা, তেমনই আরও একটি সমস্যা হল ম্যাকুলার ডিজেনারেশন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে

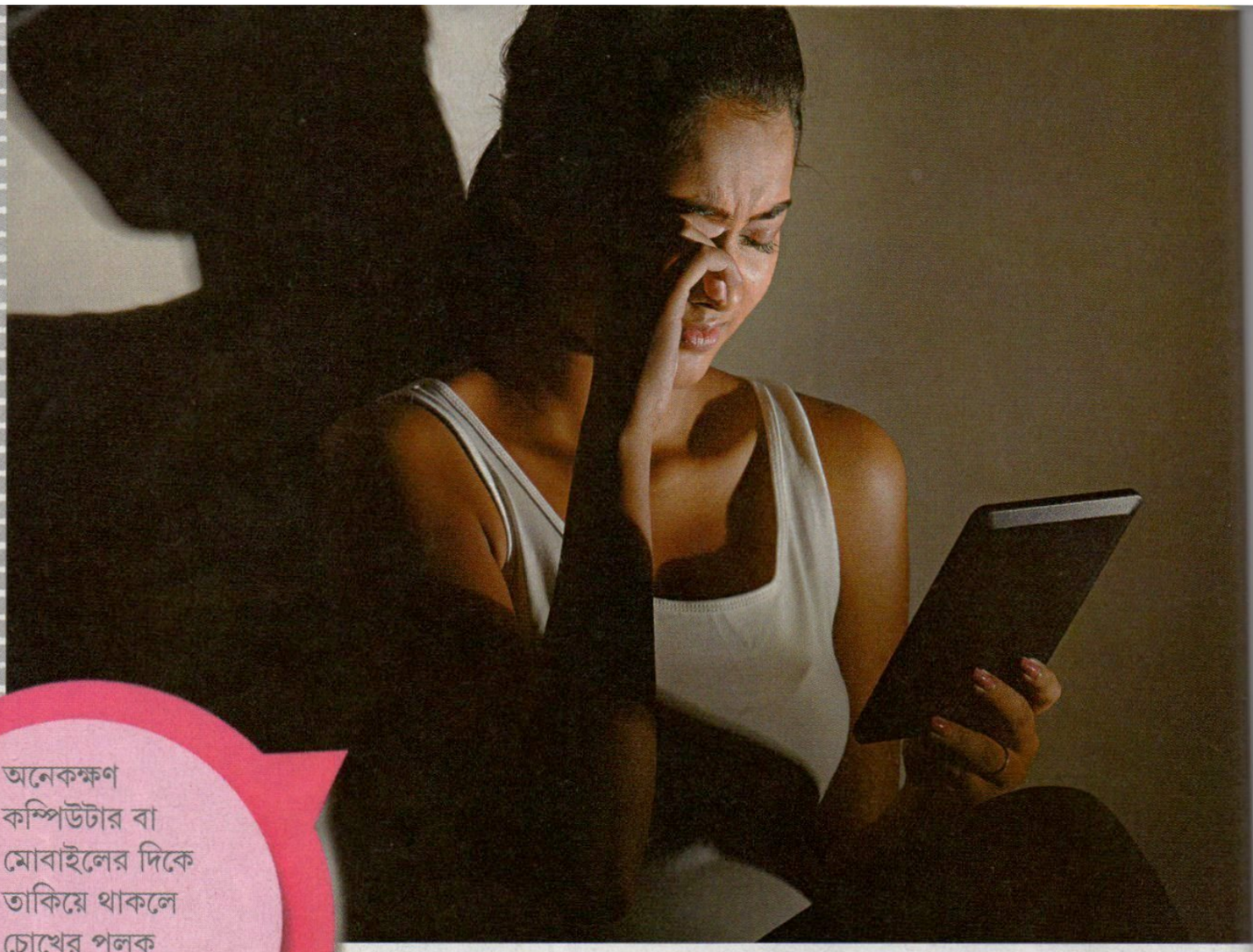

অনেকক্ষণ কম্পিউটার বা মোবাইলের দিকে তাকিয়ে থাকলে চোখের পলক ফেলি কম। ফলে অকুলার সারফেস শুষ্ক হয়ে যায়।

এটি হতে পারে। দু'ধরনের ম্যাকুলার ডিজেনারেশন হতে পারে: ড্রাই আর ওয়েট। রেটিনার ঠিক মাঝখানে (ম্যাকুলা) যদি ফ্লুইড জমে, তাহলে এই অবস্থাকে ম্যাকুলার ইডিমা বলে। ড্রাই ম্যাকুলার ডিজেনারেশনে ইডিমা হয় না। আর অন্যটিতে ইডিমা হয়। ওয়েট ম্যাকুলার ডিজেনারেশনে ভেসেল থেকে লিকেজ হয়। অ্যান্টি ভিইজিএফ ইনজেকশন দিলে দৃষ্টিশক্তি অনেকটাই ভাল হয়। তবে পুরোপুরি সেরে উঠতে পারবেন, এ কথা নিশ্চিত করে বলা যায় না। ড্রাই ম্যাকুলার ডিজেনারেশনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনও চিকিৎসা নেই। অ্যান্টি অক্সিডেন্টস খেতে বলা হয় অনেকসময়ে। যদি একই অবস্থায় থিতু থাকেন, অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তি আর নতুন করে খারাপ না হলে, ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

রেটিনা ডিট্যাচমেন্ট: রেটিনার পরদা যদি কোনও কারণে ছিঁড়ে যায়, তাহলে রেটিনা ডিট্যাচমেন্ট হতে পারে। নিয়মিত চেক-আপ করলে আগে থেকেই বোঝা সম্ভব রেটিনার কোন জায়গায় ডিট্যাচমেন্ট হতে পারে কিনা। সম্ভাব্য জায়গা লেজার দিয়ে পুড়িয়ে দিলে আগে থেকেই প্রতিরোধ করা সম্ভব। রেটিনার কিছু কিছু জায়গা দুর্বল থাকে। মায়োপিকদের ক্ষেত্রে বেশি হলেও বাকিদেরও রেটিনায় এই সমস্যা হতে পারে। হঠাৎ আঘাত লাগার ফলে রেটিনা ডিট্যাচমেন্ট হতে পারে।

ছানি বা ক্যাটারাক্ট: কর্নিয়া আর লেন্সের মাধ্যমে বাইরের আলো আমাদের চোখে আসে। ফলে সব কিছু দৃশ্যমান হয় আমাদের কাছে। বাইরের আলোকে একই বিন্দুতে মিলিত হওয়ার কাজটি করায় লেন্স। লেন্স তৈরি প্রোটিন ফাইবার দিয়ে। এই প্রোটিন ফাইবার যদি কোনও কারণে নষ্ট হয়ে যায় বা ওপেক (অস্বচ্ছ) হয়ে যায়, তাহলে লেন্সের মধ্যে দিয়ে আলো যেতে পারে না। স্বভাবতই দেখতে অসুবিধে হয়। একেই ছানি বা ক্যাটারাক্ট বলে। ছানি পড়লে রোগী সবকিছুই ঝাপসা দেখেন। চিকিৎসা হিসেবে আসল লেন্সটি সরিয়ে কৃত্রিম লেন্স বসানো হয়। যেহেতু কৃত্রিম লেন্স বসানো হচ্ছে, তাই একবার অপারেশন হয়ে গেলে দ্বিতীয়বার ছানির ফিরে আসার আশঙ্কা থাকে না। তবে যেহেতু লেন্সের পিছনের পরদা রেখে দিয়ে লেন্স বসানো হয়, সেক্ষেত্রে পরদা ভবিষ্যতে অস্বচ্ছ হয়ে যেতে পারে। তখন লেজার অপারেশন করতে হতে পারে। ছানি সার্জারির পরে এটি হতে পারে।

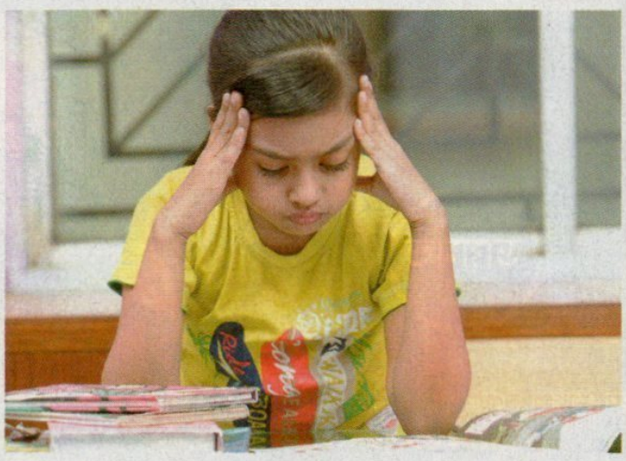

লেজি আইজ: দু'চোখের মধ্যে একটিতে যদি আপনি খারাপ দেখেন অথচ অন্য চোখটি তুলনায় অনেকটা ভাল দৃষ্টিশক্তির অধিকারী, তাহলে আপনার লেজি আইজের সমস্যা আছে। যে চোখে সমস্যা

আছে, অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তির অভাব কিন্তু ছোটবেলা থেকেই থাকে। ছোটবেলায় যদি ধরা পড়ে, তাহলে ভাল চোখকে বন্ধ করে রেখে খারাপ চোখটিকে বেশি ব্যবহার করলে ও দু'চোখের এক্সারসাইজ় করলে লেজ়ি আইজ়ের সমস্যার অনেকটা সমাধান সম্ভব। এক্ষেত্রে চশমা হল চিকিৎসার মাধ্যম। আট-ন' বছরের মধ্যে ধরা পরলে দৃষ্টিশক্তি অনেকটাই ভাল হয়ে যায়। তবে বেশি বয়সে ধরা পড়লে ভিশন ইমপ্রুভমেন্টের সম্ভাবনা কম।

ড্রাই আইজ়: চোখের অকুলার সারফেসে (কর্নিয়া ও কনজাংটিভা) কয়েকটি গ্ল্যান্ড আছে। এগুলো থেকে নানা ধরনের জলীয় পদার্থ (চোখের জল) বেরয়। ফলে চোখ আর্দ্র থাকে। চোখের পাতা বারবার পড়ার মানে হল চোখের পাতার সঙ্গে অকুলার সারফেসের ঘর্ষণ। এর ফলে সারফেসের উপর একটা প্রভাব পরে। কিন্তু যদি পর্যাপ্ত চোখের জল থাকে, তাহলে সারফেসে সেরকম প্রভাব পড়ে না। এই চোখের জলের অভাবে বা জলের কোয়ালিটি ভাল না হলে, ড্রাই আইজ় হতে পারে। আগে অনেকেই একে অ্যালার্জির সঙ্গে গুলিয়ে ফেলতেন। ড্রাই আইজ় তিনধরনের: চোখে জল কম তৈরি হলে, জলের কোয়ালিটি ভাল না হলে ও এই দু'টো সমস্যা একসঙ্গে থাকলে। কী ধরনের ড্রাই আইজ় হয়েছে, তার উপর নির্ভর করবে চিকিৎসা। আইলিডের গ্ল্যান্ড থেকে যাতে জল পর্যাপ্ত পরিমাণে বেরয়, সেদিকে গুরুত্ব দেওয়াই চিকিৎসার মূল কথা। লুব্রিকেন্ট সিক্রেশন কম হওয়ার প্রধান কারণ হল প্রদাহ। সেক্ষেত্রে অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি দিতে হবে।

কম্পিউটার ভিশন সিনড্রোম: অনেকক্ষণ ধরে কম্পিউটার বা মোবাইলের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকলে আমরা চোখের পলক ফেলি কম। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকার ফলে অকুলার সারফেস শুষ্ক হয়ে যায়। যদি দীর্ঘক্ষণ এ.সি-তে কাজ করেন, তাহলে এমনিতেই আর্দ্রতা কম থাকে। হাওয়ায় যে জলীয় বাষ্প থাকে, তা চোখকে আর্দ্র রাখে। ফলে, শুষ্ক ঘরে থাকলে চোখের সারফেসও দ্রুত শুষ্ক হবে। আর এছাড়া স্ক্রিনের থেকে একধরনের রেডিয়েশন তো হয়ই। সবকিছুই ড্রাই আইজ়ের লক্ষণ। কম্পিউটার বা মোবাইল বাদ দিয়ে দেওয়া তো সম্ভব নয়। তবে চেষ্টা করুন বারবার চোখের

পলক ফেলতে। মাঝেমধ্যে এ.সি ঘরের বাইরে গিয়ে চোখে জল দিয়ে আসুন।

আঞ্জনি: আঞ্জনি হল মূলত চোখের পাতার ইনফেকশন। চোখের পাতায় একাধিক গ্ল্যান্ড থাকে। অনেকেরই বারবার আঞ্জনি হয়। সেক্ষেত্রে আগের ইনফেকশন যদি পুরোপুরি না সারে বা ইনফেকশনের কোনও উৎস থেকে যায়, তাহলে বারবার আঞ্জনি হতে পারে। যাঁরা বারে বারে চোখে হাত দেন তাঁদের ইনফেকশনের সম্ভাবনা থাকে। চোখে ব্যথা বা চুলকানি হলেই চোখে হাত দেন। সেক্ষেত্রে আপনার রিফ্র্যাক্টিভ এরর আছে। সাময়িক অস্বস্তি হলে চোখে হাত দেওয়াটাও স্বভাবে দাঁড়িয়ে যাবে। এসব ক্ষেত্রে বারবার ইনফেকশন হয়। আবার যদি একবার ইনফেকশন হয় অথচ ইনফেকশন নিয়ন্ত্রণ করা না যায়, তাহলে দেখতে হবে আপনার ডায়াবিটিস আছে কিনা। যদি ইনফেকশন হয়, তাহলে অবশ্যই অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে। ফেলে রাখলে সমস্যা আরও বাড়তে পারে।

ডায়াবিটিস থেকে চোখের সমস্যা: ডায়াবিটিসের সমস্যা থাকলে সাধারণত ব্লাড ভেসেলগুলো সরু হয়ে যায়। ফলে রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে অক্সিজেন সরবরাহের কাজটি ঠিকমতো হতে পারে না। অস্বাভাবিক ব্লাড ভেসেল তৈরি হয়ে যায়। এগুলো বেশিরভাগই শক্তপোক্ত হয় না। ফলে ছিঁড়ে গিয়ে হেমারেজ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। ডায়াবিটিস থেকে দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়ার আর একটি কারণ হল রেটিনার মাঝখানে (ম্যাকুলা) জল জমা। অবশ্যই ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। রেটিনার অ্যাঞ্জিওগ্রাম করে দেখে নিতে হবে। কোনও কোনও জায়গায় ব্লাড সাপ্লাই কম হচ্ছে কিনা! তখন লেজারের সাহায্যে ওই জায়গাগুলো পুড়িয়ে দিতে হয়। ইডিমা বা জল জমলে অ্যান্টি ভিইজিএফ ইনজেকশন দিতে হতে পারে। প্রয়োজনে সার্জারিও করতে হতে পারে।

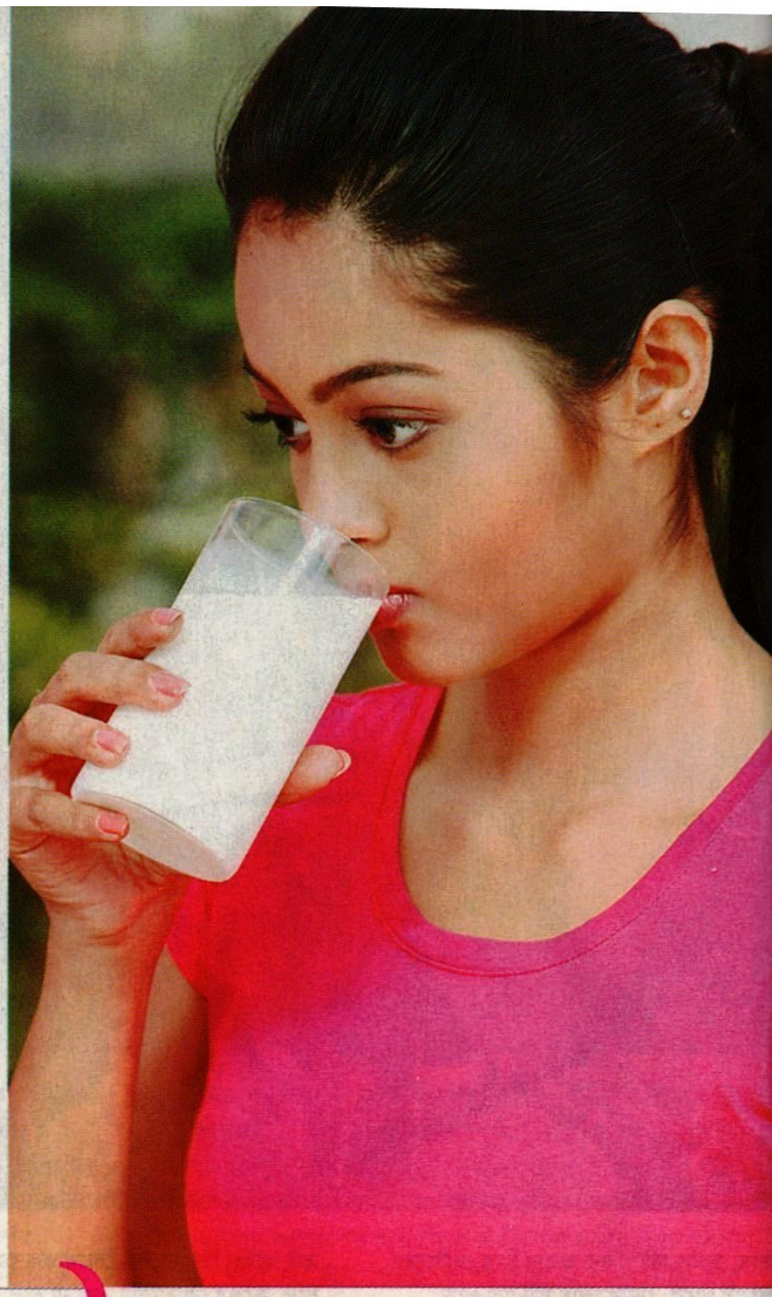

আঞ্জনি হল মূলত চোখের পাতার ইনফেকশন। যাঁরা বারে বারে চোখে হাত দেন তাঁদের ইনফেকশনের সম্ভাবনা থাকে। আঞ্জনির অন্যতম প্রধান কারণ এটি।

মনে রাখুন

সেই লুব্রিকেন্টগুলোই ভাল যাতে প্রিজারভেটিভ নেই। কিন্তু সেগুলোর দামও বেশি আর সহজলভ্যও নয়। সাধারণত আমরা যে লুব্রিকেন্ট ব্যবহার করি, তাতে প্রিজারভেটিভ থাকে। দীর্ঘদিন ধরে এধরনের লুব্রিকেন্ট ব্যবহার খুব ভাল নয়।

চোখের সমস্যায় প্রধান লক্ষণ হল ভিশন লস বা চোখে কম দেখা। ডাক্তারের কাছে গিয়ে অধিকাংশ লোক চোখ দেখান না। মনে রাখবেন, চোখের চিকিৎসায় কমপ্লিট আই চেক আপ করা প্রয়োজন।

যদি পরিবারে চোখের কোনও সমস্যা বা ডায়াবিটিসের ইতিহাস থাকে, তাঁদের তো আরওই চোখের পরীক্ষা করা প্রয়োজন। চোখের সমস্যা অবহেলা করবেন না।

চোখে একটা-দু'টো ব্ল্যাক স্পট দেখা কোনও গুরুতর অসুখ নয়। বয়স্ক মানুষরা অনেকসময়ই একটা-দু'টো ব্ল্যাক স্পট দেখেন। খেয়াল রাখবেন চোখে কম দেখছেন কিনা বা ব্ল্যাক স্পট সংখ্যায় বাড়ছে কিনা!

অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট খান। ব্যালেন্সড ডায়েট মেনে চলুন। মোটের উপর হেলদি জীবনযাত্রা আপনার চোখকেও সুরক্ষিত রাখবে।

যোগাযোগ: ৯৮৩০১২৭৯২৯

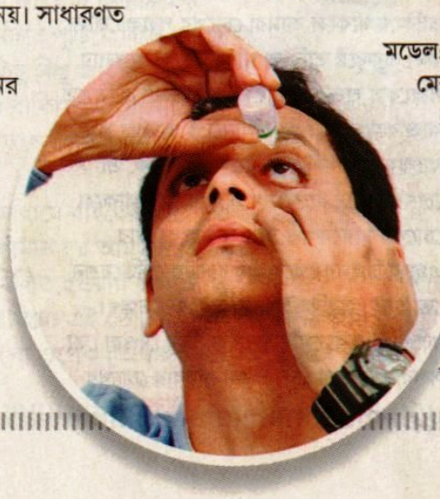

মডেল: ডিম্পল, মৃত্তিকা, সৈকত, কল্পনা, তনিষ্কা
মেক-আপ: ভাস্কর-সন্দীপ
ফোন: ৯০৫১৮২৩৫২৪
অনিরুদ্ধ চাকলাদার (৪ নং পাতার উপরের ছবি)
ফোন: ৯৮৩০০৩৯৬৯৯
পোশাক: প্যান্টালুনস, বেলতলা
ফোন: ৮১০০৯১৭৯২২
লোকেশন সৌজন্যে: সুনীল ডালমিয়া
ডা. হিমাদ্রী দত্তর চেম্বার (প্রথম ছবি)
ছবি: সোমনাথ রায় (৪ নং পাতার উপরের ছবি)
অমিত দাস